ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম *

Transparency and Accountability in Administration: Bangladesh Context. Md. Zohurul Islam

Abstract : Transparency and accountability are two interrelated components of democracy. Without these components, democracy remains incomplete. In Bangladesh transparency and accountability are absent almost in all sectors, interruption in democratic process through military rule, illiteracy and lack of mass awareness are responsible for this. For national development, there is no alternative to transparency and accountability. Uninterrupted democratic process, rule of law, educated and conscious people can play a vital role to ensure transparency and accountability in Bangladesh. Our Constitution has provision for an Ombudsman and its appointment of Ombudsman can pave the way of transparency and accountability in our country.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান প্রশাসনের উপর ন্যস্ত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের দায়িত্ব পালনে প্রশাসনের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে তা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রশাসনকে তার জবাবদিহি করতে হয়। প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার দীর্ঘসূত্রিতার ফলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতি, সরকারী অর্থ সম্পদ অপচয়, জনগণের হয়রানী ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ আছে। পত্র-পত্রিকায় চোখ পড়লেই দেখা যায় প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল। অথচ সরকারী কর্মচারীর অন্যায় কাজ ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য আছে সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি, শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি,

---

* সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

আছে দূর্নীতি দমন আইন। নাই শুধু এ সব আইনের যথাযথ প্রয়োগ। তাই আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে, দূর্নীতি রোধে, জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে, কর্মচারী শৃঙ্খলা বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করণে, প্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিত করণে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। স্থিতিশীল সরকারের নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি আনা সম্ভব।

বর্তমান প্রবন্ধে যেসব বিষয় আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে সেগুলো হলঃ (ক) প্রশাসনে বর্তমানে কি ধরনের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আছে তার পর্যালোচনা; (খ) প্রশাসনে স্বচ্ছতার আদৌও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা পর্যালোচনা; (গ) প্রশাসনে বর্তমানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার যে অভাব আছে তা চিহ্নিত করা; এবং (ঘ) প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুপরিশমালা। এ প্রবন্ধের সকল তথ্য মাধ্যমিক উৎস যেমন বিভিন্ন সেমিনারে পঠিত এ সম্পর্কিত নিবন্ধ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, রুলস অব বিজনেস, সরকারী কর্মচারী আচরণবিধি, এ সম্পর্কিত পেপার, জার্ণাল, জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী, দি অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট ইত্যাদি হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশাসন ও প্রশাসনে জবাবদিহিতা

প্রশাসনের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাসন কাজ পরিচালনা করা। মূলতঃ তিনটি ধারায় দেশ পরিচালিত হয়। প্রথমতঃ আইন পরিষদ, দ্বিতীয়তঃ শাসন বিভাগ এবং তৃতীয়তঃ বিচার বিভাগ। আইন পরিষদে আইন প্রণীত হয়। শাসন বিভাগ আইনের বাস্তবায়ন করে এবং বিচার বিভাগ কোথায়ও কিছু ঘটলে তা নিষ্পত্তি করে। সাধারণ অর্থে প্রশাসন বলতে স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের কার্যনির্বাহী বিভাগের কাজকে বুঝায়। সরকারী নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব কাজই হচ্ছে প্রশাসন। সরকার প্রধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলেই সরকার হয়। প্রশাসনের কাজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার নীতি প্রণয়ন করে, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে, বিধি বিধান প্রণয়ন

করে এবং সে মোতাবেক দপ্তর, অধিদপ্তর ও কার্যালয় তা বাস্তবায়ন করে। প্রশাসন প্রধানতঃ আইন শৃঙ্খলাসহ সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করে, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ করে, যোগাযোগ, ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মকান্ডের যথাযথ প্রসারে উৎসাহ দেয় এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনকল্যাণ ও সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

প্রশাসন এবং জবাবদিহি দুটি আলাদ শব্দ। প্রশাসন হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকে। আর জবাবদিহিতার আভিধানিক অর্থ কৈফিয়ত। অর্থাৎ জবাবদিহি হচ্ছে সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারিতে জবাবদিহিকে "A requirement to give explanations for one's actions" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রশাসনে জবাবদিহিতা বলতে প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করার সন্তোষজনক কৈফিয়ত প্রদান করা বুঝায়। জনগণকে নিয়েই সরকার। সরকারকে নিয়েই প্রশাসন। জনগণের অর্থে সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় বিধায় এখানে জবাবদিহি শুধু প্রতিষ্ঠানের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশ প্রশাসনে কোন কর্মচারী জবাবদিহিতায় ব্যর্থ হলে তাকে যে কোন প্রকার শাস্তি পেতে হয়। এ শাস্তি তিরস্কার হতে শুরু করে ফৌজদারী মামলার আসামী পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানের মুখবন্ধে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন সত্ত্বার সমৃদ্ধি লাভের অঙ্গীকারও ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। আবার সংবিধানের তৃতীয় ভাগে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহের কথা বলা হয়েছে। সেখানে অধিকারের সাথে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও নারী-পুরুষে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল সময়ে জনগণের সেবা করা প্রজাতন্ত্রের নিযুক্ত সকলের কর্তব্য। কাজেই সংবিধানের মাধ্যমে দেশের জনগণ প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে তা যথাযথভাবে পালন করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত

সকল ব্যক্তির কর্তব্য। সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দেশের যাবতীয় আইন ও বিধি-বিধানে যে ক্ষমতা প্রশাসনকে দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে জনস্বার্থে কার্যকর করা প্রশাসনের দায়িত্ব। এসব ক্ষমতা যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রশাসন জবাবদিহিতার দায়ে দায়বদ্ধ। চাকুরী ক্ষেত্রে কাজের জন্য একজন না একজনের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহির প্রথা না থাকলে স্বেচ্ছাচারিতা আসে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অনন্য কৌশল জবাবদিহিতা। দক্ষ এবং উন্নত প্রশাসনের জন্য জবাবদিহিতার জুড়ি নেই। দক্ষতা আসলে উন্নয়ন আসে।

প্রশাসনে জবাবদিহিতার বর্তমান পদ্ধতি

সরকারের নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম বিবিধ উপায় বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ উপায়গুলোকে প্রধানতঃ ৩ ভাগে ভাগ করা যায়- (ক) সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ; (খ) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও (গ) বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ।

সংসদীয় নিয়ন্ত্রণঃ মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী (সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৫৫)। এ জবাবদিহিতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি মোতাবেক বাস্তবায়িত হয়। সংসদ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও আর্থিক ও অন্যান্য জাতীয় জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিবিধ বিষয়ের জন্য অনেক স্থায়ী কমিটি গঠন করে। এসব স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে প্রশাসনের জবাবদিহিতা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতে সদস্য নিয়ে সংসদ তিন ধরনের স্থায়ী কমিটি গঠন করে থাকে- (ক) সরকারী হিসাব কমিটি; (খ) বিশেষ অধিকার কমিটি; (গ) সংসদের কার্য প্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে কোন মন্ত্রণালয়ের কাজ বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রশ্নাদির মৌখিক ও লিখিত জবাব লাভের ব্যবস্থা করতে পারে। বর্তমানে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আছে। এসব সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে জবাবদিহি করে। সংসদে প্রশ্নের জবাব হচ্ছে সংসদীয়

পদ্ধতির সরকারের বৈশিষ্ট্য। সংসদে প্রশ্নের জবাবদানের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনের জবাবদিহিতা হয়। সংসদ অধিবেশনের প্রথম ১ ঘন্টা প্রশ্ন উত্থাপন ও জবাব দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। সংসদে (ক) তারকা চিহ্নিত, (খ) তারকা বিহীন ও (গ) স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন করার বিধান আছে। তাছাড়া সংসদের মাধ্যমে জবাবদিহিতার অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে আছে- (ক) জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, (খ) জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ ও (গ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন।

প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণঃ প্রত্যেক কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জবাবদিহি করে থাকে। প্রশাসনে বিভিন্ন ধাপ আছে। এ ধাপগুলি প্রধানতঃ উর্ধ্বমূখী। বিভিন্ন ধাপের জবাবদিহিতা নিম্নবর্ণিতভাবে হয়ে থাকেঃ

ক) লিখিত রিপোর্ট/রিটার্ণ দাখিল;

খ) পরিদর্শন/ভিজিট;

গ) রুল্‌স অভ বিজনেস/সচিবালয় নির্দেশিকা;

ঘ) সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি; এবং

ঙ) অডিট।

অধঃস্তন কর্মকর্তা/কার্যালয়কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কার্যালয়ে সময় সময় রিপোর্ট/রিটার্ণ দাখিল করার বিধান আছে। এসব রিপোর্ট/রিটার্ণের মাধ্যমে অধঃস্তন অফিস/কর্মকর্তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ও সেবা প্রদানের বিষয়ে উর্ধ্বতন অফিস/কর্মকর্তা সম্পাদিত কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা নিরূপণ করে বিধি-বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে পারে। এভাবে রিপোর্ট/রিটার্ণ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা পূর্বক অধঃস্তন কার্যালয়/কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করা হয়।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধঃস্তন কর্মকর্তার কাজ সময় সময় পরিদর্শন/ভিজিট করার নিয়ম আছে। পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে করলে অধঃস্তন কর্মকর্তার দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সময়মত অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে বা সেবা প্রদান করতে অধঃস্তন কর্মকর্তা বাধ্য থাকে। কর্মকর্তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে

সম্পাদনের নিমিত্তে রুল্‌স অব বিজনেস এবং সচিবালয় নির্দেশিকা আছে। এসবের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা আছে। এসব বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা কার্যকর করা হয়।

সরকারী কর্মচারীদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে বর্ণনা সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিতে বর্ণিত আছে। এ আচরণ বিধি প্রণয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, দূর্নীতি, অনিয়মের বিষয়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা। আচরণ বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য সরকারী কর্মচারীকে শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

সরকারী কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও অফিস পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিবিধ আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে যে অর্থ ব্যয় করে থাকে তা যথাযথ ও বিধি-বিধান সম্মত হয়ে থাকে কিনা তার জন্য সরকারী কার্যালয় অডিটের নিয়ম আছে। সরকারী আর্থিক বিধি বহির্ভূত অন্যায়ভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কর্মকর্তা সরকারী অর্থ ব্যয় করলে অডিটের মাধ্যমে জবাবদিহির ব্যবস্থা আছে।

বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণঃ প্রশাসনের কোন কর্মকর্তার বেআইনী কোন আদেশ-নির্দেশ বা ক্ষমতার অপব্যবহার হলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে। জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রশাসন লংঘন করলে সে বিষয়ে জনগণ আদালতে মামলা করে প্রশাসনকে জবাবদিহি করে ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পারে।

প্রশাসনে জবাবদিহিতার বর্তমান পদ্ধতির দুর্বলতা

প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে যে সংসদীয়, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের বিধি-বিধানের ব্যবস্থা আছে তা অনেকাংশেই দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়। একটি উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রশাসন হয় স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দক্ষ। সেখানে সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। সেজন্য সরকারকে হতে হয় সর্ব কাজে স্বচ্ছ। প্রশাসনের সাথে রাজনীতির

সম্পর্ক থাকে। উপরের পর্যায়ে থাকে রাজনীতিবিদ যারা দিক নিদের্শনা দেবেন এবং পরের পর্যায়ে আসে প্রশাসন, যারা সে দিক নির্দেশনা মতো কাজ করে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা প্রশাসনিক জবাবদিহিতার পূর্বশর্ত। আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সর্বস্তরে নিয়েছে- একথা বলা যাবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়েছে একথাও ঠিক নয়। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও দরিদ্র; ধনী-দরিদ্রের সম্পর্ক এখানে আধা-সামন্ততান্ত্রিক। এমতাবস্থায় জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব আছে। যে সরকারই যখন ক্ষমতায় থাকে তাদের প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

আমাদের দেশে সক্রিয়ভাবে দীর্ঘদিন যাবত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংসদ কখনো চলেনি। মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। এসব কারণে প্রশাসনে জবাবদিহিতা করতে সংসদ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তা ও ব্যবস্থাপনা সার্ভিস দপ্তরের লোক-প্রশাসন শাখা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন সেক্টর সমীক্ষা রিপোর্টে সুপারিশ করে যে, সংসদে মন্ত্রণালয় বিষয়ক পর্যালোচনা কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে মন্ত্রণালয়ের কাজ খতিয়ে দেখা ও রিপোর্ট করার ব্যাপারে তাদের কার্যকারিতা বাড়ে। সরকারের মন্ত্রী নন এমন একজন সংসদ সদস্য এসব পর্যালোচনা কমিটির সভাপতি হবেন। রিপোর্টে আরো সুপারিশ করা হয় যে, বিরোধী দলীয় সদস্যরা এসব কমিটির কোন কোনটির এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটির প্রধান হতে পারেন।

প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যে রিপোর্ট/রিটার্ণ পর্যালোচনার ব্যবস্থা আছে তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, এসব রিপোর্ট/রিটার্ণ সাধারণতঃ খতিয়ে দেখা হয় না এবং প্রায়শঃই রিপোর্ট/রিটার্ণের উপর কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে যে পরিমাণ ভ্রমণ ভাতা দেয়া হয় তা দিয়ে পরিদর্শনকালীন থাকা-খাওয়া ও আসা-যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই অধঃস্তন কর্মকর্তাকে অধিকাংশ সময়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার জন্য নাস্তা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। তাছাড়া পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফলো-আপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না বিধায় পরিদর্শন/ভিজিট কার্যকর হয় না।

সচিবালয় নির্দেশিকা মোতাবেক নথির নিষ্পত্তি নির্দেশিকায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাস্তবে হয় না বললেই চলে। সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি বাস্তবে খুবই কম প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও এসোসিয়েশনের চাপ থাকে এবং তদবির কাজ করে। সরকারী কার্যালয়ে সাধারণতঃ খরচের বহু পরে অডিট হয়। অডিটের মাধ্যমে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টার চেয়ে দোষ ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রশাসনের জবাবদিহিতা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রশাসনের যথাযথ জবাবদিহিতা হয়না। কারণ প্রথমতঃ আদালতের মাধ্যমে শুধু অতি অল্প সংখ্যক বে-আইনী আদেশের সুরাহা হয়। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মাধ্যমে প্রশাসনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বে-আইনী আদেশের নিষ্পত্তি করতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগে। তৃতীয়তঃ এ ব্যবস্থা ব্যয় সাপেক্ষ।

আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে প্রশাসনের জবাবদিহিতার জন্য যে সমস্ত নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি আছে তার দ্বারা জনগণের সমস্যার সমাধান হয় না। এজন্যে বার বার প্রশাসনে সংস্কারের কথা উঠে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস প্রচন্ড অন্তর কলহে লিপ্ত। দূর্নীতি প্রশাসনের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের ব্যাপকতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই লেখালেখি হয়। কিন্তু রোগ নিরাময়ের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না।

জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের জন্য ন্যায়পালের প্রয়োজনীয়তা

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে তার থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা বিদ্যমান। ফলে প্রশাসনে একদিকে যেমনি দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিরপেক্ষতার অভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হতাশা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান অপরদিকে স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম, অদক্ষতা, তোষামোদ, কাজে দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের অভাব আছে। এদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান কার্যকর করা হলে আশা করা যায় যে, অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। উন্নত গণতান্ত্রিক বহু দেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর থাকায় সেখানে

সচিবালয় নির্দেশিকা মোতাবেক নথির নিষ্পত্তি নির্দেশিকায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাস্তবে হয় না বললেই চলে। সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি বাস্তবে খুবই কম প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও এসোসিয়েশনের চাপ থাকে এবং তদবির কাজ করে। সরকারী কার্যালয়ে সাধারণতঃ খরচের বহু পরে অডিট হয়। অডিটের মাধ্যমে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টার চেয়ে দোষ ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রশাসনের জবাবদিহিতা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রশাসনের যথাযথ জবাবদিহিতা হয়না। কারণ প্রথমতঃ আদালতের মাধ্যমে শুধু অতি অল্প সংখ্যক বে-আইনী আদেশের সুরাহা হয়। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মাধ্যমে প্রশাসনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বে-আইনী আদেশের নিষ্পত্তি করতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগে। তৃতীয়তঃ এ ব্যবস্থা ব্যয় সাপেক্ষ।

আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে প্রশাসনের জবাবদিহিতার জন্য যে সমস্ত নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি আছে তার দ্বারা জনগণের সমস্যার সমাধান হয় না। এজন্যে বার বার প্রশাসনে সংস্কারের কথা উঠে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস প্রচন্ড অন্তর কলহে লিপ্ত। দূর্নীতি প্রশাসনের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের ব্যাপকতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই লেখালেখি হয়। কিন্তু রোগ নিরাময়ের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না।

জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের জন্য ন্যায়পালের প্রয়োজনীয়তা

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে তার থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা বিদ্যমান। ফলে প্রশাসনে একদিকে যেমনি দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিরপেক্ষতার অভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হতাশা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান অপরদিকে স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম, অদক্ষতা, তোষামোদ, কাজে দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের অভাব আছে। এদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান কার্যকর করা হলে আশা করা যায় যে, অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। উন্নত গণতান্ত্রিক বহু দেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর থাকায় সেখানে

প্রশাসন শুধু গতিশীলই হয়নি বরং এ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশাসনের অনিয়ম কার্যকরভাবে দূরীভূত হয়েছে।

ন্যায়পালের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগাদির তদন্তকারী কর্মচারী (An official appointed to investigate complains against public authorities)। ন্যায়পাল একটি প্রতিষ্ঠান। এ দেশে সংবিধানে ন্যায়পালের ধারণার কথা উল্লেখ থাকলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সরকার (আওয়ামী লীগ) ক্ষমতায় আসার পর ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করলেও তা সংসদের প্রাচীর ও পত্রিকার মুদ্রণের মধ্যেই থেকে যায়।

১৮০৯ সাল থেকে সুইডেনে ন্যায়পালের প্রতিষ্ঠান চলে আসছে। এখন ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা, ভারতসহ উন্নত গণতান্ত্রিক বহু দেশে এ প্রতিষ্ঠান আছে। পার্লামেন্ট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাধারণতঃ বিচারপতি বা প্রশাসনে অভিজ্ঞ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ন্যায়পাল মনোনয়ন করে থাকে। প্রশাসন যাতে দেশের আইন ও বিধি-বিধানের বাহিরে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করা ন্যায়পালের কাজ। ন্যায়পাল স্বাধীনভাবে কাজ করে। যে কোন সরকারী বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি পরিদর্শন ও প্রয়োজনে তদন্ত করা ন্যায়পালের কাজ। কোথাও কোন ব্যতয় ঘটলে তার আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানায়। সুইডেনের প্রধান পার্লামেন্টারী ন্যায়পাল সি একলুনদ এর ভাষায়- "Administrative errors do into happen simply because of the existence of the Ombudsman."

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ১৫ নম্বর আইন) পাশ হয়। এ আইন, যে তারিখ হতে সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কার্যকর করতে চাইবে, সে তারিখ হতে কার্যকর হবে। এ আইনে ন্যায়পালের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনের পদ্ধতির বিধানাবলী আছে। এ আইন মোতাবেক সংসদের সুপারিশে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। সততার জন্য সুখ্যাত, প্রশাসনে বা আইনে দক্ষ কোন ব্যক্তি ন্যায়পাল হতে পারবেন। ন্যায়পালের কার্যকাল হবে তিন বৎসর। তবে পুনরায় আর একবার তাঁকে নিয়োগ করা যাবে।

শারীরিক অকর্মণ্যতা বা অসদাচরণের জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে ন্যায়পালকে অপসারণ করা যাবে। আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির যে সুযোগ-সুবিধা ও বেতন থাকবে ন্যায়পালও তা ভোগ করবেন।

কোন ব্যক্তি যদি ন্যায়পালের নিকট এ মর্মে অভিযোগ করে যে, (১) কোন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা সরকারী কর্মচারী তার প্রতি কোন প্রকার অবিচার করেছে, অথবা (২) কোন ব্যক্তিকে অবৈধ সুযোগ দেয়া হয়েছে বা নিজে অবৈধ সুযোগ নিয়েছে অথবা এ ধরনের কোন অভিযোগের বিষয় অন্য যে কোনভাবে ন্যায়পাল জানতে পারলে সে বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন। ন্যায়পাল কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ হাজির করতে বলতে পারবেন।

ন্যায়পাল তদন্ত করে যদি বুঝতে পারেন যে, কোন সরকারী কর্মচারীর অপকর্মের ফলে কোন ব্যক্তির প্রতি অবিচার করা হয়েছে তবে ন্যায়পাল ঐ সরকারী কর্মচারীর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সে মর্মে রিপোর্ট দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুরাহা করতে বলবেন। এ রিপোর্টের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময় শেষ হবার ১ মাসের মধ্যে ন্যায়পালকে অবিহত করতে হবে।

কোন সরকারী কর্মকর্তা অন্যায় লাভের জন্য অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে অন্যায় সুবিধা দেয়ার জন্য যদি কোন কাজ করে এবং ন্যায়পাল তদন্তক্রমে সে মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তিনি ঐ সরকারী কর্মকর্তার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সে মর্মে প্রতিবেদন দিয়ে তার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা বা বিভাগীয় মামলা বা শৃঙ্খলা জনিত অপরাধের ব্যবস্থা নিতে বলতে পারবেন। এ প্রতিবেদন পাবার ১ মাসের মধ্যে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা ন্যায়পালকে জানাতে হবে।

ন্যায়পালের তদন্তের বিষয়ে প্রচুর ক্ষমতা থাকলেও তাঁর কোন নির্বাহী ক্ষমতা নেই। তাঁর মতামতের উপর কোন কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হয় না। এভাবে তাঁর কাজের ভারসাম্য বজায় থাকে।

আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ যথাযথভাবেই এদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

(১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারবেন। সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। ন্যায়পাল তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হবে। ১৯৮০ সালে সরকার ন্যায়পালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংজ্ঞায়িত করে ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সালের ১৫নং আইন) প্রণয়ন করে। কিন্তু সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারী করে এখনও এ আইন কার্যকর করা হয়নি।

রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ–এর অস্থায়ী সরকারের আমলে ১৯৯১ সনে দেশের উন্নয়নের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ২৯টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। সরকারের অপকর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত (Government malpractice) টাস্ক ফোর্স প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ন্যায়পালের পদ সৃজনের জন্য সুপারিশ করে- "Introduction of the Ombudsman system in Bangladesh with necessary modifications, will go a long way to help prevent abuse of power of the executive wing of the government... The Task Force recommends creation of the post of 'Naypal' with broad legal authority to perform his task."

১৯৯৩ সালে ইউএনডিপির বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন সেক্টর সমীক্ষা রিপোর্ট প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ন্যায়পাল নিয়োগের সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশে বলা হয়ঃ "(৫) সংবিধানের ৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত ন্যায়পালের (Ombudsman) বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। ন্যায়পালের ধারণার কথা সংবিধানে উল্লিখিত থাকলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের নালিশ শোনা ও বিচার বিবেচনা করার জন্য কিছুটা তৈরী পদ্ধতি থাকা জরুরী।"

১৯৯৩ সালে মন্ত্রি পরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমানসহ সরকারের অপর তিনজন সচিবের একটি দল যুক্তরাজ্যে- "Towards Better Government: Principles into Practice" শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন ও পরে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে ১৯৯৩ সনে প্রধান মন্ত্রীর নিকট ৯৮ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, তাতে প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। প্রতিবেদনে সত্বর ন্যায়পাল আইন কার্যকর করার জন্য সুপারিশে বলা হয় (পৃষ্ঠা-৫৮)ঃ "4.49 Parliament has, in 1980 enacted a law (Act no 15 of 1980) providing for the office of Ombudsman. The Act provides for the appointment of a person with known legal or administrative ability and conspicuous integrity. The law will come into being as soon as a notification to that effect in issued by the Government. It is recommended that the decision on giving effect to the law be taken soon."

এমতাবস্থায় সংবিধানে ন্যায়পাল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-এর আলোকে এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহমেদের সময়ের টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ, ইউ এন ডি পি-এর লোক-প্রশাসন সমীক্ষা রিপোর্ট এবং চার সচিবের বাংলাদেশে সরকার সংক্রান্ত প্রতিবেদনের (Towards Better Government in Bangladesh) সুপারিশ মোতাবেক ১৯৮০ সাল ন্যায়পাল নিয়োগের যে আইন প্রণীত হয়েছিল তা অবিলম্বে কার্যকর করা সুসরকার গঠনের জন্য অপরিহার্য।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা

আভিধানিক অর্থে যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ ঘটে তাই স্বচ্ছ। যেমন কাঁচ। কিন্তু প্রশাসন কাঁচ নয়। প্রশাসনের কার্যাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহের ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ হয় না। তাহলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা বলতে আমরা কি বুঝবো? প্রশাসনের ভিতর দিয়ে যা প্রতিসরণ করতে পারে তা হচ্ছে- "Various kinds of information for public observation perusal and guidance. Information about government decisions,

activities, plans, programmers, policies, etc., can be transmitted and furnished made visible and intelligible through various ways and means to the public"... প্রশাসন যখন কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে তখন সেই কাজটি প্রশাসন কিভাবে করছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণার অনুভূতিকে আমরা প্রশাসনের স্বচ্ছতা বলতে পারি।

সুতরাং প্রশাসন যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করে, পরিকল্পনা, কর্মসূচি বা নীতি গ্রহণ করে, সে সব সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি বা নীতি কেন, কার জন্য এবং কি পদ্ধতিতে নেয়া হলো সে সব তথ্য যখন প্রশাসন জনগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে উন্মুক্ত করে অথবা সে সব তথ্য বা ভেতরের খবর যখন জনগণের কাছে প্রতিবন্ধহীন ভাবে লভ্য হয় তখন তাকে স্বচ্ছ প্রশাসন বলা যেতে পারে।

প্রশাসনে স্বচ্ছতার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

প্রশাসনে স্বচ্ছতা রাষ্ট্রের নাগরিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। শুধু তাই নয়, সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম প্যারাতে বলা হয়েছে, আমরা বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠন করিয়াছি। সকল কিছুর উপরে জনগণ। সুতরাং যে জনগণের জন্য প্রশাসনের সকল কর্মোদ্যোগ, সেই জনগণের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন সকল নীতি, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম কেন হলো, কিভাবে হলো ও কার জন্য হলো- সে সব তথ্য জনগণের জানার জন্য উন্মুক্ত করার যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাকে প্রশাসনে স্বচ্ছতার ধারণা বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যদি জনগণ হয় আর জনগণের সেবা করা যদি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হয়, তাহলে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের শর্ত পূরণের জন্যই প্রশাসনে স্বচ্ছতা প্রয়োজন। যে জনগণের হয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা কাজ করছেন, সেটা ঠিক করছেন না বেঠিক

করছেন, ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে করছেন না সীমার মধ্যে আছেন, কাজটা নিজ স্বার্থে না গোষ্ঠী বা ব্যক্তি স্বার্থে করা হচ্ছে, তাতে জনগণের কল্যাণ বয়ে আনবে না অকল্যাণ হবে, এগুলো শুধু তখনই জনগণ বিচার-বিবেচনা করতে পারবেন যখন প্রশাসনের প্রতিটি কর্মকান্ডের খবরের পেছনের খবর জনগণ জানতে পারবেন।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। সরকারের কাজ কর্ম যদি স্বচ্ছ হয় তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা হয়তো হবে, কিন্তু শেষ ফল হবে সরকারের উপর জনগণের আস্থার বৃদ্ধি। সরকারের স্থিতিশীলতা জনগণের আস্থার উপর নির্ভরশীল। স্থিতিশীল সরকার অর্থ হচ্ছে নীতির স্থিতাবস্থা যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থাবলী

ক) জাতীয় সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের বক্তব্য তুলে ধরার ব্যবস্থা;

খ) মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে সংসদের নিকট মন্ত্রীর দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা;

গ) মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে গঠিত ষ্টান্ডিং কমিটির নিকট মন্ত্রী/ কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা;

ঘ) কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া পাবলিক ডকুমেন্ট বলে চিহ্নিত রেকর্ড প্রাপ্তির ব্যবস্থা;

ঙ) সংবাদপত্রে মত প্রকাশের ব্যবস্থা;

চ) বাজেট, সরকারী গেজেট, বিভিন্ন প্রকাশনা, অডিট, মূল্যায়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা;

ছ) রুলস অব বিজনেসের মাধ্যমে প্রশাসন ও সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা কতটুকু কাম্য

প্রশাসনে স্বচ্ছতা কতটুকু থাকা উচিত ও অনুচিত সে সম্পর্কে যেমন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে তেমনি ধারণারও ঘাটতি ও অস্পষ্টতা আছে। অনেকের ধারণা, প্রশাসনকে স্বচ্ছ করতে হলে নথিতে লেখা নোটও গণমাধ্যমে প্রচারিত হতে

হবে। অনেকে মনে করেন, অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট ১৯২৩ প্রশাসনে স্বচ্ছতার অন্তরায়। গোপন বলে প্রশাসনে কিছু থাকা উচিত নয়। কিন্তু নথিতে তো এমন কিছু বিষয় থাকতে পারে যেটা প্রকাশ পেলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে। সেটা কি প্রকাশ করা ঠিক হবে? আবার অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট ১৯২৩ উঠিয়ে দিয়ে প্রতিরক্ষার সকল খবর স্বচ্ছতার নামে দেশী-বিদেশী সবার কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? তা হলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই যে হুমকীর সম্মুখীন হবে। তাহলে স্বচ্ছতা কতটুকু থাকা উচিত? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে।

আসলে গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে যেগুলো গোপন রাখা উচিত সেগুলো প্রথমে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তারপর বাকী যেগুলো থাকবে, যেমন সংসদের বাজেট ও অর্থ সংক্রান্ত কমিটিসহ সকল কমিটির কার্যবিবরণী, উন্নয়ন সংক্রান্ত, নিয়োগ-পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত, অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠানসহ সকল রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি সংক্রান্ত ফাইল, যেগুলো জনগণের ট্যাক্সে পরিচালিত সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজ সংবাদ মাধ্যমের জন্য উন্মুক্ত করে লোক সম্মুখে তুলে ধরা যেতে পারে। অহেতুক প্রতি ফাইলে, প্রতিটি চিঠি-পত্রে টপ সিক্রেট, সিক্রেট, কনফেডিনসিয়াল ও রেষ্ট্রিকটেড সীল মেরে সেগুলোকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখার প্রয়াস সরকার ও প্রশাসনের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে মাত্র।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও সরকারী কর্মকর্তার সীমাবদ্ধতা

প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনতে সরকারী কর্মকর্তার সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনার আগে কয়েকটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ যথাক্রমে নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগকে সুস্পষ্টভাবে ভাগ করে প্রত্যেক অঙ্গের কাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রশাসন যন্ত্র নির্বাহী বিভাগের অধীন। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসন পরিচালনার তত্ত্বাবধান করেন। এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণের কাছে তাদের কর্মসূচী পেশ করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তবেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা পান। এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন এটাই জনগণের কাছে দেওয়া তাদের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার তারা রক্ষা করছেন কি-না সেটা জনগণকে জানানো তাদের দায়িত্ব। কারণ তাদেরকে ক্ষমতায় থাকতে হলে বারবারই জনগণের কাছে যেতে হবে।

ক্ষমতাসীন দল জনগণের কাছে তাদের দেওয়া অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করে প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে। সুতরাং প্রশাসন কি করছে না করছে সে খবর জনগণের কাছে খোলামেলা করে দেওয়া ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় থাকার স্বার্থেই প্রয়োজন। জনগণ এসব খবর জানতে পারেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মারফত। রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্র যদি স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণ করতে পারে, সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকে, সর্বোপরি, সংবাদ সূত্রগুলো যদি প্রশাসনিক আদেশ নির্দেশের খবরদারী মুক্ত হয়, তবেই জনগণ জানতে পারবে যাদেরকে তারা ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে তারা আদৌ ভোটারদের কাছে দেওয়া তাদের অঙ্গীকার রাখছে কি-না।

প্রশাসন যন্ত্রের ভেতরের পরিবেশ এবং প্রশাসনে যারা কাজ করেন তাদের মন-মানসিকতা স্বচ্ছতার পক্ষে-বিপক্ষে উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রশাসন যন্ত্রের ভেতরের পরিবেশ যদি সন্দেহ, অবিশ্বাস, হতাশা, তিক্ততা এবং বিদ্বেষপূর্ণ হয় এবং এর সাথে যদি দায়িত্বহীনতা, অযোগ্যতা এবং রাষ্ট্রীয়, বিভাগীয় আর্থিক ও আইনগত দূর্নীতির প্রসার ঘটে তখন সব কিছুকে আড়াল করার প্রবণতা বেড়ে যায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অনেকগুলো সংসদীয় কমিটি কাজ করে। এ সব কমিটি নিয়মিত বৈঠকে বসে এবং এসব বৈঠকের আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ ও সিদ্ধান্ত জনগণের জানার জন্য সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশন করা যায়। মন্ত্রী পরিষদের নিয়মিত বৈঠক হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে এ ধরনের বিষয় ছাড়া অন্য সব ধরনের আলোচনার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত জনগণকে জানানো যেতে পারে। সংসদীয় কমিটিগুলো ও মন্ত্রী পরিষদ যখন এসব খবর জনগণকে জানাতে অনাগ্রহী হয় তখন তা প্রশাসন যন্ত্রকে তথা প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করে এবং তাদের মধ্যে সব কিছুতে গোপনীয়তার দেয়াল সৃষ্টি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা এবং গণ সচেতনতা প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে একটি বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে। দেশে শিক্ষিতের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকলে এবং সেই জনগোষ্ঠীর নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা থাকলে রাষ্ট্রের

রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন জবাবদিহিতার জন্য বাধ্য হয় তেমনি প্রশাসনও গোপনীয়তার সীমা সংকুচিত করে আনে। এসব ছাড়াও রয়েছে সাংবিধানিক রক্ষা কবচের প্রশ্ন। জনগণের জানার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে যদি সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকে তাহলে প্রশাসনের জনগণকে জানানোর বাধ্য-বাধকতা থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যদি বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, এখানে একদিকে রয়েছে জনগণের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকারের অভাব, অন্যদিকে সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা লেখা থাকলেও রেডিও, টিভির মত সংবাদ মাধ্যমগুলো সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন, সংবাদপত্রের মাথার উপর ঝুলছে প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের মত নিবর্তনমূলক খড়্গ। সরকারী বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রয়েছে সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। সংসদীয় কমিটিগুলো বৈঠক করে, মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক হয়। কিন্তু এসব বৈঠকের যে খবর জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রেসে দেওয়া তা এত স্বল্প যে সেটা পড়ার জন্যও কারো আগ্রহ জন্মায় না। এমনকি জনকল্যাণে গৃহিত সিদ্ধান্তগুলোও এমন গোপনীয়তার সাথে পাহারা দেওয়া হয় যে সেগুলো যুদ্ধ দলিলের মর্যাদা পায়। কোন গুরুতর ঘটনার উপর সরকার যদি প্রেস নোট দেয় মানুষ তা বিশ্বাসই করে না।

প্রশাসন যন্ত্রের ৬৩রের পরিবেশ বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রশাসনিক ক্যাডার ও প্রকৃচি-বিসিএস ২৬ ক্যাডার দ্বন্দ্ব এখন আর রাখ-ঢাকের পর্যায়ে নেই। কর্মকর্তার নিয়োগ-বদলী-পদোন্নতির মাপকাঠি সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। কর্মকর্তাদের মেধার মান নিয়ে এখন সভা-সেমিনারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ সার্ভিস সহ সার্বিকভাবে প্রশাসনের দূর্নীতি প্রবাদ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

জনগণের শিক্ষার হার ও সচেতনতা অত্যন্ত নিম্ন পর্যারে। দারিদ্র সব কিছুকে গ্রাস করেছে। সংবিধানে সংবাদ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা থাকলেও সরকার ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মৌলিক অধিকার হিসেবে

নাগরিকের জানার অধিকারের স্বীকৃতি নেই। এর উপর রয়েছে আইনগত বিধি-নিষেধ। রুলস অব বিজনেসের পঞ্চম অধ্যায়ের ২৬(১) ধারায় বলা হয়েছেঃ "No information acquired directly or indirectly from official documents or relating to official maters shall be communicated by a government servant to the press, to non-official or even officials belonging to other government offices, unless he has been generally or specially, empowered to do so."

সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধির ১৯ ধারায় বলা হয়েছেঃ "A government servant shall not, unless generally or specially empowered by the government in this behalf, disclose directly or indirectly to government servants belonging to other ministries, divisions or departments, or to non-official persons or to the press, the contents of any official document or communicate any information which has come intohis possession in the course of his official duties, or has been prepared or collect by him in the course of those duties, whether from official sources or otherwise". একই বিধির ৩২ ধারায় বলা হয়েছেঃ "Contravention of any of these rules shall be construed as misconduct within the meaning of the Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 and a Government servant found guilty of such contravention shall drender himself liable to disciplinery actionunder the aforsaid rules." সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ অনুযায়ী Misconduct এর জন্য একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তা censure থেকে শুরু করে বাধ্যতামূলক অবসরে যাওয়ার শাস্তি পেতে পারেন।

এমনিতেই বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রশাসনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়। উপরন্তু, রুলস অব বিজনেস ও সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধির উপরোক্ত ধারাগুলো সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে রীতিমত হুমকী দিচ্ছে

প্রশাসনে স্বচ্ছতার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য। কোন সৎ, বিবেকবান, নীতিবান ও দেশপ্রেমিক সরকারী কর্মকর্তা যদি দেশ ও জনগণের প্রতি তার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রশাসনের লৌহ যবনিকা একটু ফাঁক করে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণকে কিছু দেখাতে চান তবে তাকে নিগৃহীত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েই তা করতে হবে। অন্যথায় নয়।

প্রশাসনে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার সম্পর্ক

প্রশাসনে জবাবদিহিতা আসে স্বচ্ছতার মাধ্যমে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা রাষ্ট্রের নাগরিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। সরকারের কর্মকান্ড, নীতি, পরিকল্পনা সবকিছু জানা যায় স্বচ্ছতা থেকে। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ বুঝতে পারে সরকারের তথা প্রশাসনের স্বরূপ-দুর্বলতা-ত্রুটি এবং ভালো দিক। সুতরাং রাষ্ট্রের সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকাকে সুস্পষ্ট করে স্বচ্ছতা আর স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে জবাবদিহিতার বিষয়টি বেরিয়ে আসে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বয়স সিকি শতক পেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশ জন্মসূত্রে তার প্রশাসন ব্যবস্থা লাভ করেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্বার্থে যে প্রশাসন ব্যবস্থা পত্তন হয়েছিল ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ তার উত্তরাধিকার। বৃটিশ শাসনামল থেকে বর্তমান সময়ের ব্যবধান অনেক। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা এবং জাতিগঠন, উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মধ্য দিয়ে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের যে আকাঙ্ক্ষা তার সঙ্গে প্রশাসন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার সীমাবদ্ধতা প্রশাসন যন্ত্রের আধিপত্য ও সুংসহত অবস্থানকে পরিবর্তন করতে পারেনি।

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাবে বাংলাদেশের প্রশাসন অন্যান্য অনুন্নত দেশের মত অপপ্রশাসনে (Mal-Administration) এ পরিণত হয়েছে। এ প্রশাসনের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য হলো (ক) দীর্ঘসূত্রিতা; (খ) কর্ম-বিমুখতা; (গ) ঘুষ-দূর্নীতি;

(ঘ) আইন মান্য না করে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করা; (ঙ) বিদ্বেষ; (চ) কাজকে নিজের দায়িত্ব মনে না করা; (ছ) পক্ষপাতিত্ব, স্বজন প্রীতি; (জ) দাম্ভিকতা; (ঝ) ক্ষমতার অপব্যবহার করা; (ঞ) অতিরিক্ত গোপনীয়তা; (ট) চাটুকারিতা; হস্তক্ষেপ করার মানসিকতা; (ড) নৈতিকতার অভাব; (ঢ) প্রভূত্ববাদী মনোভাব এবং (ণ) জনবিচ্ছিন্নতা।

অপপ্রশাসন কখনই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে, যোগ্যতার সাথে, দক্ষতার সাথে পালন করতে পারে না। নিজেদের স্বার্থে কাজ করে উন্নয়নের এজেন্ট হিসেবে এদের ব্যবহার করা কঠিন বিষয়। আর সে কারণে নীতি প্রণীত হয়, বাস্তবায়িত হয় কিন্তু ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা না থাকার জন্য বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে উন্নয়নকামী ও উন্নয়নের এজেন্ট হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ধারণা গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রশাসনের পূর্বশর্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পূর্ব কথা হলো ক্ষমতাসীন দলের সরকারকে সংসদের কাজে জবাবদিহি রাখা। জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠান। সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা সরকার প্রধান মনোনীত হয় এবং মন্ত্রী সভা তার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনা করে। সরকারের গৃহীত নীতি, পরিকল্পনা, আইন, বিল যেমন সংসদে আলোচিত হয় তেমনি সকল কাজের গঠনমূলক সমালোচনাও হয়। জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যমে এ বিষয়গুলোকে জন সমক্ষে আনে, ফলশ্রুতিতে সরকারের সকল কাজ সুস্পষ্টভাবে জনগণ জানতে পারে। সরকার পার্লামেন্টে এভাবে জবাবদিহি করে।

সরকার প্রশাসন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারের নীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয় প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে। সরকারের সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে প্রশাসন যন্ত্রের উপর। সে কারণে সরকার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে

প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ পার্লামেন্টের কাছে তথা জনগণের কাছে এবং সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করে থাকে।

উপসংহার ও সুপারিশ

একটা দেশের প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নির্ভর করে সে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি তথা মূল্যবোধ ও পরিবেশ দ্বারা। আর রাজনৈতিক পরিবেশ এবং প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সফলভাবে প্রয়োগ করার সামর্থ্য নির্ভর করে সে দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পরিবেশের উপর। স্থায়ী জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ।

২. প্রশাসন ও রাজনীতি পরস্পরের পরিপূরক। রাজনৈতিক ব্যর্থতা উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পিছিয়ে দেয়। তাই রাজনীতিবিদ ও আমলা শ্রেণীর মধ্যে বিরোধিতা নিরসনের পদক্ষেপ নিতে হবে। তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়-প্রতিযোগী নয় বরং অংশীদারিত্বে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে পরিবেশ গঠন করতে হবে। মন্ত্রী ও সচিবদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুস্পষ্ট হবে। বর্তমানে সরকারের নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম (ক) সংসদের মাধ্যমে (খ) প্রশাসনের মাধ্যমে এবং (গ) বিচার বিভাগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রচলিত এই ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর। তাই রাজনৈতিক জবাবদিহিতা অর্জন করা দরকার।

৩. আমলাতন্ত্র বা আমলাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রচলিত আইন ও বিধি, যেমন-সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন।

৪. ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠাঃ সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিধান থাকলেও আজও সে পদ সৃষ্টি হয়নি যদিও বিভিন্ন সময়ে সুপারিশ

করা হয়েছে। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্কের রীতি অনুসরণে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করতে পারলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন সম্ভব হবে। সে জন্য অনতিবিলম্বে ১৯৮০ সালের ন্যায়পাল আইন কার্যকর করা দরকার। তা ছাড়া বিচারক নিয়োগ নিরপেক্ষ করতে হবে।

৫. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণঃ বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়ন প্রশাসনের মৌল কৌশল। বর্তমান যুগে প্রতিটি উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশ বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন, যেখানে রাজনীতিবিদ, আমলা ও জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে, তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

৬. প্রশাসনিক সংস্কারঃ বর্তমানে প্রচলিত মাথাভারী প্রশাসন ব্যবস্থা সংকুচিত করতে হবে। দেশে গতিশীল, দক্ষ, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, সৎ, নিরপেক্ষ প্রশাসনের জন্য বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তার প্রয়োজন নেই। এ লক্ষ্যে অদক্ষ, দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছাঁটাই করা যেতে পারে। ছাঁটাইকৃত জনবলকে ভিন্নতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়মূলক কর্মকান্ডে নিয়োগ করে বা আত্মীকরণের মাধ্যমে প্রয়াস নেয়া যেতে পারে। নুতন নিয়োগ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা যেতে পারে। থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ১৯৭৯ সালে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করে সুফল লাভে সমর্থ হয়েছে।

৭. প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি, পদায়ন, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি মেধা, দক্ষতা ইত্যাদিকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে।

৮. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। এজন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্স এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করে উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেলে জবাবদিহিতাবোধ আসতে পারে।

৯. গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণঃ বিগত অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সামরিক শাসনের ফলে দেশে সামরিক আমলাতান্ত্রিক জোটের শাসন বিস্তার লাভ করে। এতে জন প্রতিনিধিদের সার্বিক কর্তৃত্বে কাজ করে যাবার মানসিকতা আমলাদের গড়ে উঠেনি। গণতন্ত্রকে লালন ও চর্চার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

১০. দূর্নীতি দমন ব্যুরোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা প্রয়োজন।

১১. প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করতে হবে এবং কার্যকরী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

১২. প্রশাসনের জন্য বাস্তবভিত্তিক, যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা দরকার। এটি করা সম্ভব হলে সততা অর্জন সম্ভব হবে আর সে সঙ্গে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৩. শিক্ষা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। জানার অধিকারকে (Right to know) সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

১৪. তথ্য প্রবাহ ব্যবস্থার মুক্ত প্রসারণ স্বচ্ছতা আনতে পারে। এজন্য গণ-মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

১৫. মহিলা সাংসদকে সরাসরি নির্বাচন করা এবং সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ বর্জন করতে হবে।

দূর্নীতি, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থ-চরিতার্থ করণের উলঙ্গ পাঁয়তারা সমগ্র জাতিকে হতাশা আর অন্ধকারের অতল আবর্তে নিক্ষেপ করছে। জাতির উন্নয়ন কর্মকান্ডে চরম নৈরাজ্য ও বন্ধ্যাত্ব নেমে এসেছে। সততার দূর্ভিক্ষ বর্তমানে ভয়াবহ রূপে জাতির জীবনে বিদ্যমান। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন বলে শাশ্বত বাণীটির খেলাপ ঘটছে প্রতিনিয়ত। সত্য ও সততার নির্বাসন ঘটেছে। প্রশাসনে শাসন আছে তবে নেই কর্তব্যবোধ। জবাবদিহিতার পাট উঠে গেছে ধীরে ধীরে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা আনতে পারলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, ফলশ্রুতিতে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা আসবে যা উন্নয়ন কর্মকান্ডকে তরান্বিত করবে।

তথ্য নির্দেশিকা

আল-ফারুক, এম এম (১৯৯৭) *সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ৮৫ এবং আচরণ বিধি ৭৯ এর বিশ্লেষণ,* ৪র্থ সংস্করণ। ঢাকা।

উল্লাহ, মাহবুব (১৯৯৪) *বাংলাদেশে প্রশাসনের জবাবদিহিতাঃ কতিপয় প্রসঙ্গ।*

১৪ই জুলাই, ১৯৯৪ তারিখে বিসিএস প্রশাসন একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশের উন্নয়নে লোক-প্রশাসনের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে পাঠিত প্রবন্ধ।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (১৯৯৩) *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন সেক্টর সমীক্ষা রিপোর্ট*। ঢাকাঃ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী।

জামিল, কঙ্কা (১৯৯৫) *আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিঃ উন্নত ও উন্নয়নগামী কতিপয় দেশের অভিজ্ঞতা*। লোক-প্রশাসন সাময়িকী, ৪র্থ সংখ্যা-ডিসেম্বর-১৯৯৫। ঢাকাঃ বিপিএটিসি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (১৯৯২) *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী-বিধি*। ঢাকা ঃ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১৯৯২) প্রশাসনে স্বচ্ছতা শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণী। ঢাকাঃ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮) *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*। ঢাকাঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

Ahmed, Ali (1981) *Basic Principles and Practices of Administrative Organization.* Dhaka: NILG.

Ahmed, Ali (1993) *Ombudsman for Bangladesh.* Dhaka: Academic Publishers.

Ahsan, Ekramul and Syed Naquib Muslim (January 16-20, 1994). *Accountability in Civil Service : The Bangladesh Context.* Dhaka: BPATC.

Day, Patrica and Kleir Rudolf (1987) *Accountabilities.* London: Tavistick Publications.

Gellhorn, Walter (1966) *Ombudsman and others : Citizens Protectors in Nine Countries.* Cambridge : Harvard University Press.

GOB. (1996) *Rules of Business.* Dhaka : Cabinet Division.

Islam, Saiful A.F.M. (1995) *Accountability and Transparency in Administration.* Handout. 23rd ACAD, BPATC.

Rahman, Ayebur M., et al. (1993) *Towards Better Government in Bangladesh.* Dhaka : Bangladesh Government.

Stacey, Frank (1978) *Ombudsma Compared.* Oxford: Clarendon Press.